ভোরের কাগজ

JAN 1 7 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

কোনো খেদ নেই

ফখরুজ্জামান চৌধুরী

ভর্তিযুদ্ধ আর পাঠ্যপুস্তকের কথা

শিক্ষা জগতে হাল আমলের সবচেয়ে গরম ...র হলো পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি এবং রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিযুদ্ধের বিষয়। শব্দটা ছিল ভর্তি পরীক্ষা। কিন্তু হালে ভর্তির নামে বিভিন্ন স্কুলে, বিশেষ করে রাজধানীর নামীদামি স্কুলগুলোতে যা হচ্ছে তাকে পরীক্ষা না বলে যুদ্ধ বলাই ভালো।

অভিজ্ঞ একজন শিক্ষিকা বললেন, ইদানীং যা হচ্ছে তাতে স্কুল প্রাঙ্গণকে মনে হয় মল্লযুদ্ধ ক্ষেত্রের মতো, আর কোমলমতি শিশুদেরকে মনে হয় দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নিষ্পাপ শিশুদের মতো। এদেরকে অভিভাবকরা নিয়ে আসেন পরীক্ষা দিতে।

কাক ডাকা সকালে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের টেনে হিঁচড়ে ঘুম থেকে তুলে তৈরি করা হয়। চোখে ঘুম নিয়ে কাতরভাবে স্কুলের উদ্দেশ্যে তারা রওয়ানা হয় বাবা-মায়ের সঙ্গে।

বিত্তবানদের সন্তানরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে যথেষ্ট অনুশীলন করে প্রস্তুতিপর্বটা ভালোভাবে সেরে নেয়। তদুপরি অর্থ-বৈভবের কারণে তাদের পিতা-মাতার সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে ভর্তির ব্যাপারে তারা একরকম নিশ্চিতই থাকে।

তারপরও তো তাদের পরীক্ষা দিতে হয়।

প্রাগুক্ত শিক্ষিকা বললেন, আসলে ভর্তির পরীক্ষা দেন অভিভাবক-অভিভাবিকারা। বিশেষ করে রাজধানীর নামকরা কয়েকটি স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের বেলায় এই কথাটি বেশি প্রযোজ্য।

ছাত্রছাত্রীদের ওপর থাকে পরীক্ষার চাপ আর স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর থাকে সামাজিক চাপ। বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপের ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ হিমশিম খান।

একজন প্রধান শিক্ষক পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কথা সত্য, ভর্তির সময় বিভিন্ন ধরনের চাপে পড়তে হয়। এই বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ। এমন কি সন্ত্রাসী চাপও আছে।

স্কুল যেই এলাকায় সেই এলাকার মাস্তানদের জন্য নাকি ভর্তির একটা কোটা নির্ধারিত থাকে। সেই কোটা পূরণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রচণ্ড চাপ মোকাবিলা করতে হয়। কেউ কেউ হয়তো এই ধরনের চাপ সামাল দিতে পারেন। তবে এ জন্য তাকে মারাত্মক ঝুঁকি যে নিতে হয় তা বলাই বাহুল্য। বরং জো হুকুম বলাই সহজ এবং নিরাপদজনক। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি! এমন চিন্তা থেকে আজকাল অনেকেই অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করেন। এই ধরনের সমঝোতা যে সামাজিক অবক্ষয়কে আরো সুদূরপ্রসারী করে তোলে, সে বোধ বিজ্ঞ শিক্ষকদের আছে।

ভর্তি পরীক্ষায় দুধরনের চিত্র দেখা যায়। কোনো কোনো স্কুল ছাত্রছাত্রীদের চাপে রীতিমতো হিমশিম খায়, আর কোনো কোনো স্কুল ছাত্রছাত্রী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে দিতে খরচান্ত। এই বৈষম্য কেন?

বাবা-মা সঙ্গত কারণে চাইবেন, তাদের সন্তানরা ভালো স্কুলে লেখাপড়া করুক। মধ্যযুগের পিতা-মাতার কামনা ছিল আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

এখনকার পিতা-মাতারা অবশ্যই চান তাদের সন্তানরা প্রতীকী অর্থে দুধে ভাতে থাকুক। কিন্তু শুধু দুধ ভাতের সংস্থানেই তাদের সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। সন্তানদের জন্য তাদের চাহিদা আরো অনেক বেশি। সন্তানের সুশিক্ষা এখন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়।

সুশিক্ষা প্রদান করতে পারে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। মেধা তালিকায় যে সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি, অবলীলাক্রমে সেসব স্কুলকে অভিভাবকরা ভালো স্কুলের অভিধায় ভূষিত করেন। আর করবেন না-ই বা কেন? ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, নাথিং সাকসিড্‌স্ লাইক সাকসেস। সাফল্যের মতো সফল আর কিছু নেই।

হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে যা বিশ্বাসযোগ্য করা যায় না, পাবলিক এক্সামিনেশনের মেধা তালিকায় ছাত্রছাত্রীর নামের সঙ্গে স্কুলের নামের উল্লেখেই তা অবলীলাক্রমে হয়ে যায়। আর একবার যদি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম হয়ে যায়, অনেক দিন তার সুরভি বাতাসে ছড়াতে থাকে।

আমরা অনেকটা একরৈখিক চিন্তায় অভ্যস্ত। বীর বানাতে যেমন পারি সহজে, ভিলেনও বানাতে পারি তেমনি সহজে। ছোটা শুরু করলে এক দিকে ছুটতে থাকি। ভালো স্কুলের ব্যাপারেও তাই।

একটি স্কুল খুবই ভালো হতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য স্কুল যে একদম বাজে, এমন বোধ তো সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক নয়।

স্কুল পড়ায়, ছাত্রছাত্রী পড়ে। ভালো ছাত্রছাত্রীরা যদি পাল্লা দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্কুলে ভর্তি হয়, তা হলে কয়েকটি স্কুলের ফলাফলই শুধু ভালো হবে। ভালো ছাত্রছাত্রীর অভাবে গড়পড়তা মানের ছাত্রছাত্রী নিয়ে অন্যান্য স্কুলের ফলাফল আশানুরূপ না হলে সেসব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

নামকরা স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যার সঙ্গে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার আনুপাতিক হারের বেজায় বৈষম্যের কারণে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়। গড়পড়তা ছাত্রছাত্রীদের তো কোনো সুযোগই থাকে না, রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সমূহ। কারণ প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে এক ধরনের ভীতি সব সময়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করে। পরীক্ষার হলের পরিবেশ শিক্ষার্থীর অজানা এবং অনেক সময়ে প্রতিকূল বিবেচিত হওয়ার ফলে জানা জিনিসও পরীক্ষার্থী ভুলে যায়।

প্রচুর ছাত্রছাত্রীর মহাসম্মিলনে অজানা অচেনা শিক্ষক শিক্ষিকাদের সামনে, পরিচিত প্রিয় অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে সহজেই কোমলমতি বালক-বালিকারা ভড়কে যায় এবং অনেক সময় পরীক্ষা না দিয়েই পরীক্ষার্থীর হল ত্যাগের ঘটনা বিরল নয়।

ভালো ছাত্রছাত্রীরা যদি পাল্লা দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্কুলে ভর্তি হয়, তা হলে কয়েকটি স্কুলের ফলাফলই শুধু ভালো হবে। ভালো ছাত্রছাত্রীর অভাবে গড়পড়তা মানের ছাত্রছাত্রী নিয়ে অন্যান্য স্কুলের ফলাফল আশানুরূপ না হলে সেসব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যে যথাযথ চিত্র তুলে ধরে এমন দাবি বোধ করি স্কুল কর্তৃপক্ষও করবেন না। বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপে ফলাফল পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

অবস্থা এখন এমন যে, মহল্লার মাস্তানরাও ভর্তির ব্যাপারে তাদের কোটা দাবি করে এবং তাদের দাবি পূরণও করা হয়। কারণ মাস্তানের হাতে আছে ভয়ঙ্কর অস্ত্র আর শিক্ষকের হাতে নিরীহ কলম। কলম অসির চেয়ে শক্তিশালী কথাটা বলে শিক্ষক আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন. কিন্তু তিনি যে অস্ত্রের সামনে খুবই অসহায়। এই কথাটাও ভোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভর্তি পরীক্ষা শেষে নতুন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে। উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশনপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হওয়ার পথে। এখন ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই থাকার কথা। স্কুল প্রদত্ত বুকলিস্ট ধরে ধরে অভিভাবকদের বইয়ের দোকানে দোকানে বই খুঁজে বেড়ানোর মৌসুম এটা। নতুন বই কেনাতে অভিভাবকের যেমন আনন্দ, তেমনি নতুন বই পেতে আনন্দ ছাত্রছাত্রীদের।

তবে এবার সে আনন্দ থেকে নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। কেন বঞ্চিত তার কারণ বহুল আলোচিত। যদিও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছেন বই না পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো বই পাওয়া যাচ্ছে না, এবং কবে পাওয়া যাবে তারও কোনো ঠিক নেই।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা সংক্ষেপে এনসিটিবি ছয় মাসের মধ্যে দু'দুটি বড়ো মাপের কেলেঙ্কারির জন্ম দিয়ে অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যদিও প্রথমটির কথা বোধ হয় বর্তমান কেলেঙ্কারির ব্যাপকতার কারণে মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে এবং এনসিটিবি সরাসরি তার সঙ্গে জড়িত ছিল না। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্টতার কারণে নামটি এসেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক স্কুলের সম্পূরক বইয়ের যে ৯০০ বইয়ের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল শিশুদের পাঠের অনুপযোগী। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু বই নাকি আবার শিশুদের জন্য ক্ষতিকর, এমনকি বয়স্করাও পড়তে গেলে বিব্রত হতেন। এনসিটিবির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন উপকমিটি বইগুলো বাছাই ও কেনার সুপারিশ করেছিল।

এবার এনসিটিবি এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে ৫ কোটি ৬২ লাখ বই ছাপানোর কার্যাদেশ দিয়েছিল যাদের প্রকাশনা সংক্রান্ত তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যে এতো বিপুল সংখ্যক বই সময়মতো ছেপে দিতে পারে।

নির্ধারিত সময়ে বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রিপ্রেস ও শুকতারা নামক তিনটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ধারণানুযায়ী বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় মেয়াদ বৃদ্ধি করে তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয় ২১ ডিসেম্বর। ওই দিনের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের সবগুলো বই মুদ্রণ ও বাঁধাই করে তা জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময়সীমাও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বেক্সিমকোর পক্ষে।

ইতিমধ্যে পত্রিকান্তরে পুস্তকার তরফ থেকে '২০০১ শিক্ষাবর্ষের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক ক্রয়ে আগ্রহী পুস্তক বিক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে যাতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ২১ জানুয়ারির মধ্যে চাহিদা মাফিক বইয়ের মূল্য পরিশোধ করে তাদের কার্যালয় থেকে ডেলিভারি অর্ডার নিয়ে বই উত্তোলনের অনুরোধ করা হয়েছে।

আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ঠিকানার হেরফের যদি আগ্রহী ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে তা হলে দোষ দেওয়া যাবে না।

কোনো বিজ্ঞাপনেই কিন্তু অন্য ঠিকানার উল্লেখ নেই।

বই কিনতে গিয়ে আগ্রহী ক্রেতা বিভ্রান্ত হতেই পারেন।

হয়তো তখন আবার বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।

বই কেলেঙ্কারি নিয়ে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন কিন্তু কম ছাপা হয়নি।

ফখরুজ্জামান চৌধুরী : কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক অনুবাদক।